

কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের  
কৃষক বিরোধী কালা কৃষি আইন  
প্রতিরোধ করুন

অল ইণ্ডিয়া কিশাণ ক্ষেত মজদুর সংগঠন  
(এ আই কে কে এম এস)

৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩

কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের কৃষক বিরোধী কালা কৃষি আইন প্রতিরোধ করুন

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০২০

প্রকাশক :

অল ইণ্ডিয়া কিশাণ ক্ষেত মজদুর সংগঠন

(এ আই কে কে এম এস)

৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩

মুদ্রণ :

গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য : ১০ টাকা

# কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের কৃষক বিরোধী কালা কৃষি আইন প্রতিরোধ করুন

বিজেপি সরকার সম্প্রতি যে তিনটি কৃষি আইন প্রণয়ন করেছে, সেই আইন কি, তার চরিত্র কি, তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি, এই আইন কার স্বার্থ রক্ষা করবে, এ আইন কেন করা হয়েছে, এই আইন আমাদের দেশের কোটি কোটি অসহায় সাধারণ মানুষের জীবনে কি বার্তা বহন করে আনবে, এ সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা ও চিন্তাকে ভিত্তি করে আমাদের তা বুঝতে হবে। দেশ জুড়ে কৃষকরা আজকে রাজপথে। কুরুক্ষেত্রে যে বিশাল কৃষক বিক্ষোভ হয়েছিল সরকার তাকে লাঠি গুলি টিয়ার গ্যাসের দ্বারা দমন করার চেষ্টা করেছে। AIKKMS এই আন্দোলনের পাশে ছিল। পাঞ্জাবের কৃষকরা যখন তাদের বনধ-এর আহ্বান রেখেছে, AIKKMS তাদের পাশে ছিল।

আবার গত ২৫শে সেপ্টেম্বর গ্রামীণ ভারত বনধ-এর ডাক দেওয়া হয়েছিল এবং এ দেশের আপামর গরীব সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের অভূতপূর্ব সমর্থনের ফলে সমস্ত দমননীতিকে অগ্রাহ্য করেসেই গ্রামীণ ভারত বনধ সফল হয়েছে। AIKKMS দেশের ১৫টি রাজ্যে এই বনধ সফল করার জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ নিয়েছে। হাজার হাজার গ্রামে AIKKMS গেছে, মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে, অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছে, শত শত জায়গায় রাস্তায় বিক্ষোভ অভিযান পরিচালনা করেছে, পথ অবরোধ করেছে, সংগঠনের বক্তব্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং আমরা লক্ষ করেছি দেশের গরিব খেটে খাওয়া মানুষ — কৃষক, দিনমজুর, ক্ষেতমজুর — তারা আমাদের বক্তব্য অত্যন্ত হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছেন, আন্দোলনের পাশে থেকেছেন। তাদের এই সমর্থনের বলে বলীয়ান হয়েই আমাদের সংগঠন ১৪ই অক্টোবর দেশব্যাপী কৃষক প্রতিরোধ দিবস পালনের ডাক দিয়েছে। কারণ কৃষকদের তো এই কালা কানুন প্রতিরোধ করতেই হবে। কৃষকের সামনে তো আর কোনো পথ খোলা নেই। একটাই মাত্র পথ খোলা আছে তা হচ্ছে প্রতিরোধের পথ, বিদ্রোহের পথ। একটা ঘরের মধ্যে মানুষকে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা-জানলা সমস্ত বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তার সামনে বেরোবার একটাই মাত্র পথ থাকে তা হচ্ছে

দেওয়াল ভেঙে বেরিয়ে তার নিজের জীবন রক্ষা করার ব্যবস্থা করা। আমাদের দেশের কৃষকদের অবস্থা হয়েছে তাই। বিদ্রোহ ছাড়া, প্রতিরোধ ছাড়া তার সামনে আর কোন পথ দেশের শাসক সম্প্রদায় খোলা রাখেনি। তাদের এই বুকেরবেদনা অনুভব করে AIKKMS ১৪ই অক্টোবর এই প্রতিরোধ দিবস পালনের আহ্বান রেখেছে এবং আমরা জানি দেশের লক্ষকোটি কৃষক এই প্রতিরোধ দিবস সফল করতে পথে নামবেন। তারা প্রতিরোধের আওয়াজ তুলবেন, তারা সংগ্রামে সামিল হবেন।

## দেশের কৃষকদের বর্তমান অবস্থা :

দেশের কৃষকরা আজ পথে কেন? কি কারণে? শখ করে? কোন কাজ নেই বলে? আমাদের দেশের গ্রামের অবস্থা কি? সরকারি পরিসংখ্যান বলছে আমাদের দেশে যত জোত আছে যাকে বলে হোল্ডিং, তার শতকরা ৮৬ ভাগ অলাভজনক। চাষ করে কোন লাভ হয় না। গ্রাম ভারতে যত পরিবার আছে তার ৫৮% এর কোনো জমিনেই। একসময় আমাদেরদেশে কোন ভূমিহীন পরিবার ছিল না। বর্তমানে অবস্থা হল এই। আবার কৃষকের জোত অলাভজনক কেন? কী তার কারণ? স্বামীনাথন কমিশন কয়েক বছর আগে একটা রিপোর্ট দিয়েছে। প্রখ্যাত কৃষিবিশেষজ্ঞ স্বামীনাথন এই রিপোর্টে কি বলেছেন? তিনি বলেছেন, যদি অন্য কোন পেশার ব্যবস্থা গ্রাম ভারতের কৃষকরা করতে পারত তাহলে শতকরা ৪০ ভাগ কৃষক এখনই কৃষিকাজ ছেড়ে দিত। কোন আয় নেই উপায় নেই, শহরে কোন কাজ নেই, শহর বেকারে ভর্তি, ফলে বাধ্য হয়ে জমির সাথে এই মানুষগুলো আটকা পড়ে আছে। এই হল স্বামীনাথন কমিশনের রিপোর্ট। এখন আমাদের বুঝতে হবে কৃষিকাজ অলাভজনক কেন? কি কারণে? এই কথাবোবার জন্য বড় অর্থনীতিবিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই। আয় থেকে যখন ব্যয় বেশি হয় তখনই তা অলাভজনক হয়। তখনই কৃষক ঋণগ্রস্ত হয়। এই হল সোজা কথা।

সম্প্রতি এক রিপোর্ট বলছে, ভারতবর্ষে প্রতি ১২ মিনিটে একজন কৃষক আত্মহত্যা করে। ২০১৯ সালেই শুধু আত্মহত্যা করেছে ৪২ হাজারের বেশি কৃষক। গত ১৫ বছরে চার লক্ষের উপর কৃষক আত্মহত্যা করেছে। কেন এই আত্মহত্যা? ঋণের দায়ে। চাষ করতে যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী লাগে যেমন বীজ, সার, মাটির তল থেকে জল তোলার মেশিন, তার জন্য ডিজেল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি হল ইনপুট। এর দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ইনপুট-এর দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, চাষ করার খরচ বাড়ছে, যত চাষ করার খরচ বাড়ছে, ততই চাষ করার জন্য নগদ টাকার প্রয়োজন হয়। গত বছর এক বিঘে জমি চাষ করতে খরচ হয়েছিল ধরে নিন ১০ হাজার টাকা। সমস্ত ইনপুট এর দাম দ্বিগুণ হয়ে গেল। নগদ টাকা

লাগবে ১৬/১৭ হাজার টাকা। দুই বিঘে-দেড় বিঘে জমির মালিকের জোত অলাভজনক। চাষ করে লাভ হবে এর কোনো গ্যারান্টি নেই। চাষের জন্য প্রয়োজনীয় নগদ টাকা এই চাষীকে দেবে কে? ব্যাংক দেবে না। এরা যখন লোনের জন্য ব্যাংকের কাছে যাবে ব্যাংক বলবে, তোমাকে লোন দেওয়াটা রিস্কি, কারণ এনপিএ হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ, লোন পাবে না। পাবে না, সরাসরি বলে না ওরা। কিন্তু দেয় না। তাই নগদ টাকার জন্য এই গরিব চাষি কোথায় যায়? যায় সুদখোরের কাছে। যখন জো এসে গেছে, ধান রুইতে হবে, ফসল কাটতে হবে, যখন টাকার খুব প্রয়োজন সে সুদখোরের কাছেই যায়। সুদখোর বলে, তোমাকে আমি টাকা দেব ভাই। কিন্তু তোমাকে শতকরা আট টাকা-দশ টাকা হারে সুদ দিতে হবে। না বছরে নয়, প্রতি মাসে। প্রতি মাসেই তোমাকে আট-দশ টাকা হারে সুদ দিতে হবে। বাস্তবে চাষীকে ৯৬ থেকে ১২০ পারসেন্ট হারে সুদ দিতে হবে। এই সুদে চাষীকে টাকা ধার করতে হবে। সারের দাম বাড়ছে, তেলের দাম বাড়ছে, জলের দাম বাড়ছে, বিদ্যুতের দাম বাড়ছে, ডিজেলের দাম বাড়ছে, বীজের দাম বাড়ছে, সুদখোর মহাজনের নিষ্পেষণ বাড়ছে ফলে চাষের খরচ বাড়ছে। ফলে সহজেই বোঝা যায় গ্রাম ভারতে চাষীর কি করণ অবস্থা।

এইবার ফসল যখন উঠলো তখন তার দাম পাওয়ার ব্যবস্থা খুবই কম। লাভের গুড় পিঁপড়া খেয়ে নেয়। একটা হিসাব বলছে ধানের দামে ৫৩ শতাংশ পায় চাষী, ৩১ শতাংশ পায় ফড়ে। শাকসবজি ও ফলের ক্ষেত্রে চাষীর অংশ



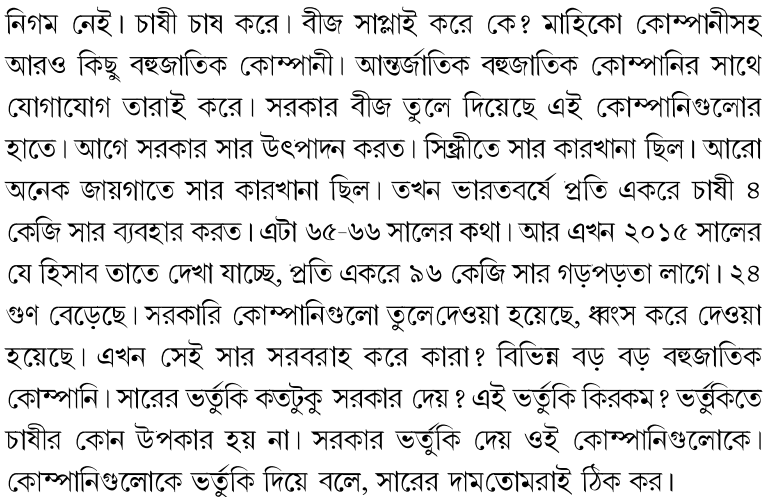
আরো কম। তা যথাক্রমে ৩৯ ও ৩৪ শতাংশ। এথেকে পরিষ্কার, চাষী ফসলের দাম পায় না। এর ফলে চাষীর হাত থেকে জমি চলে যাওয়ার হার বাড়ছে, ক্ষেতমজুরের সংখ্যা বাড়ছে। এই যে পরিযায়ী শ্রমিকদের দেখা যাচ্ছে, এরা কারা? লকডাউন-এর ফলে ভারতবর্ষে ১৬কোটি পরিযায়ী শ্রমিক বাড়িতে আসতে এক একজন হাজার, আটশ, বারোশ কিলোমিটার হেঁটেছে। এরা কারা? এরা হচ্ছে গ্রাম ভারতের কৃষক পরিবারের হতভাগ্য মানুষেরা, যারা এলাকায় কাজ নাপেয়ে কৃষিকাজেকোনো লাভ না হওয়ার জন্য, পরিবার-পরিজন সন্তান-সন্ততি গ্রামের মায়া, এলাকার মায়া সমস্ত কিছু ত্যাগ করে, দূরে যেয়ে দুটো পয়সা ইনকাম করার জন্য পড়ে আছে। এই সব পরিযায়ী শ্রমিক হচ্ছে গরিব কৃষক পরিবারের সন্তান। এই হল ভারতবর্ষের গ্রামের প্রকৃত চিত্র। AIKKMS দীর্ঘদিন ধরে তিনটে দাবি সরকারের কাছে রেখেছে। এক হচ্ছে কৃষি পণ্য উৎপাদন করবার যে সমস্ত শিল্প সামগ্রী লাগবে, ইনপুট লাগবে তা সস্তা দরে সরকারকে সরবরাহ করতে হবে।

দুই, কৃষকের সমস্ত কৃষিক্ষণ মুকুব কর।

আর এমন ব্যবস্থা করো যাতে চাষীদের ভবিষ্যতে ঋণ করতে না হয়।

তিন, চাষীর ফসল লাভজনক দাম দিয়ে সরকারকে কিনতে হবে।

স্বামীনাথন কমিশন বলেছে, চাষীর উৎপাদন খরচা যা হয়, সেই উৎপাদন খরচার দেড় গুণ দাম দিতে হবে। স্বামীনাথন কমিশন যা বলেছে সরকার তা দেয় না। সরকার চাষীর ফসল সামান্য কেনে, খুব একটা বেশি কেনে না। আর একটা দাবী আমরা জোরের সাথে তুলছি, তা হল, গ্রাম ভারতে যে ক্ষেতমজুর, দিনমজুর আছে, যাদের জমি নেই, মানে চাষ করে খাওয়ার উপায় নেই, যাদের পরিশ্রম বিক্রি করে পথ চলতে হয়, সংসার চালাতে হয় সেই শ্রমজীবী মানুষদের সারা বছর কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। এটা সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এদের সারা বছর বাঁচার মতো মজুরি দিতে হবে। কিন্তু সে ব্যবস্থা হয়নি। ফলে গ্রাম ভারতের অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হয়েছে। ১০ বছর আগে সারের দাম যা ছিল তার তিন গুণ চার গুণ হয়েছে। বীজের দাম কোন কোন ক্ষেত্রে দশগুণ হয়েছে। বিদ্যুতের দাম বাড়তে বাড়তে আকাশছোঁয়া হয়েছে, ডিজেলের দাম পেট্রলের দামকে অতিক্রম করে গেছে। কেন এরকম হল? কারণ কী? কারণ সরকার তার দায়িত্ব অস্বীকার করছে। সরকার সমস্ত কিছু তুলে দিয়েছে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী পুঁজিপতিদের হাতে। এক সময় ভারত সরকারের বীজ নিগম ছিল। বীজ নিগম বীজ তৈরি করত বিভিন্ন রাজ্য সরকারের বীজ নিগম ছিল। তারা বীজ তৈরি করত, চাষী সেই বীজ নিগম থেকে সার্টিফায়েড বীজ কম দামে পেত। ধীরে ধীরে এই নিগমগুলো তুলেদেওয়া হল। এখন আর কোনো



বাঘের কাছে গরু রেখে যদি বলা হয়, গরুটাকে ভাই তুমি দেখো। গরুও প্রাণী, তুমিও প্রাণী। গরুটা বাঘের পেটে গিয়ে শান্তিতে বসবাস করবে। এক্ষেত্রেও হয়েছে তাই। সরকার বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে বলছে, সারের দাম তুমি ঠিক কর। কোম্পানিগুলি কেমন ঠিক করছে? পটাশ-এর দাম কেমন বেড়েছে? ইউরিয়ার দাম কেমন বেড়েছে? ফসফেটের দাম কেমন বেড়েছে তা আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি। চার পাঁচ ছয় গুণ দাম বেড়েছে। কোম্পানিগুলোর মুনাফার পাহাড় ফুলেফেঁপে উঠছে। মরণ হচ্ছে চাষীর। এই হচ্ছে অবস্থা। কীটনাশক-এর উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। যেমন ধরুন একজন ব্যবসায়ী একটা দোকান খুলে বসে আছে, চাষী গিয়ে বলল, আমারতো ধানে পোকা লেগেছে, কি করবো?

দোকানদার যে কীটনাশকে লাভ বেশি হয় সেটাই দেয়। কীটনাশকের মান সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখার কোনো সরকারি অফিস নেই, ব্যবস্থা নেই। দামের উপর কোন সরকারি নিয়ন্ত্রণ নেই। সঠিক কীটনাশক কিনা, পোকা মারা পড়বে কিনা তা দেখবার সরকারি কোনো ব্যবস্থানেই। কোম্পানিগুলো যা প্রচার করে, তার এজেন্টের মাধ্যমে যে কীটনাশক বিক্রি করে, সেই কীটনাশক কিনে এনে চাষী চাষ করতে বাধ্য হয়। এইসব জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া হল কেন? অন্যতম প্রধান কারণ হল, সরকার সমস্ত দায়িত্ব অস্বীকার করে তা বেসরকারি হাতে তুলে দিয়েছে। যাকে অর্থনৈতিক পরিভাষায় বলে বেসরকারীকরণ। ওরা বলে, বাজারই সব ঠিক করবে। বাজার নিয়ন্ত্রণ করে কে? সারের দাম কি চাষী নিয়ন্ত্রণ করে? বীজের দাম কি চাষী নিয়ন্ত্রণ করে? তেলের দাম কে নিয়ন্ত্রণ করে? কীটনাশকের দাম কে নিয়ন্ত্রণ করে? ডিজেলের দাম কে নিয়ন্ত্রণ করে? চাষির নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতানেই। সরকার নিয়ন্ত্রণ করে না। সবটাই বহুজাতিক পুঁজির দখলে। এর ফলে দাম বাড়বেই, চাষীর উপরে বেশি বেশি করে আঘাত আক্রমণ নেমে আসছে, নেমে আসবেই। বিগত ৩০- ৩৫ বছর ধরে ভারতবর্ষে এই ঘটনাই ঘটছে। ভারতবর্ষ একটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। পুঁজিবাদশোষণ করেই। সেই শোষণের মধ্যেও যতটুকু সরকারি প্রোটেকশন ছিল, যতটুকু সরকারি সহায়তা পাওয়া যেত, ৯০ সালের পর থেকে এই প্রোটেকশন আস্তে আস্তে তুলেদেওয়া হল, কংগ্রেস সরকার এই প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। তারপর যারা যারা ক্ষমতায় এসেছে তারা একই কাজ করেছে। এসব সত্ত্বেও যতটুকু সরকারি সুবিধা পাওয়া যেত, মরতে মরতে এখনও পর্যন্ত যতটুকু বেঁচে বর্তে ছিল, বিজেপি সরকার তিনটে আইন পাস করার দ্বারা তাকে একবারে গলা টিপে মেরে ফেলল। বলা যেতে

২৫ সেপ্টেম্বর গ্রামীণ ভারত বন্ধে অভূতপূর্ব সাড়া/পশ্চিমবঙ্গের ছবি





পারে কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দিল। তাই আমাদের বুঝতে হবে এই আইনের প্রয়োগ হলে তা কতটা ভয়াবহ হবে। এই তিনটে আইন আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাব, কী সর্বনাশ বিজেপি সরকার দেশের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। দেশের গরীব সাধারণ মানুষের কত বড় সর্বনাশ ওরা করেছে।

## বিজেপি সরকারের নতুন কৃষি আইন

প্রথম আইনের বলে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় সবকিছুর উপরে সরকারি নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়া হচ্ছে। চাল, ডাল, মুসুর ডাল, মুগের ডাল, বিউলির ডাল, খেসারীর ডাল, ছোলার ডাল, গম, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা সরষের তেল, নারকেল তেল, দুধ, মাছ, মুরগি, ছাগল, ভেড়া, গুয়ার — সব। যা মানুষের জীবনে প্রতিদিন প্রয়োজন হয়, যাকে আমরা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য বলি — সরকার তার ওপর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ তুলে দিয়েছে। এই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস, প্রতিদিন যা লাগে, যা না হলে আমাদের চলবে না সরকার বলছে তা নিয়ন্ত্রণ করার মধ্যে যাব না। আগে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ ছিল। কি নিয়ন্ত্রণ ছিল? এই সব জিনিস, এসেনশিয়াল কমোডিটিস, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস, বহুজাতিক পুঁজি মানে ধরুন রিলায়েন্স কোম্পানি, বিড়লার কোম্পানি, আদানির কোম্পানি, বাইরের বহুজাতিক কোম্পানি — কোকাকোলা, পেপসি এরা বাজার থেকে কিনে মজুত করতে পারত না। বর্তমানে যে আইন করা হল, তাতে এরা এই ধরনের জিনিসপত্র যথেষ্ট কিনে গুদামজাত করে রাখতে পারে। যতটুকু সরকারি নিয়ন্ত্রণ ছিল, সরকার বলল আর নিয়ন্ত্রণ আমরা করব না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই আইনের গুণগান গেয়ে একটা লেখা লিখেছেন, টাইমস অফ ইন্ডিয়াতে, গত ২৪শে জুন। তাতে কি লিখেছেন? তিনি বলছেন, এই আইনের আপত্তি করছ কেন, এই আইনবলে কৃষক দেশের যে কোন প্রান্তে যাবে, তার ফসল বিক্রি করতে পারবে এবং নিজের ইচ্ছেমত দামে বিক্রি করতে পারবে। ভেবে দেখুন একবার, যে চাষী দেড়-দুই বিঘা জমির মালিক, যার ফসল জমিতে থাকতেই বিক্রি হয়ে যায়, যার ঘর নেই, পরনে কাপড় নেই, পেটে নেই ভাত, সেই চাষী ফসল ধরে রাখবে, বস্তাবন্দি করবে, গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে যাবে আর নিজের ইচ্ছেমত দামে বিক্রি করবে। করতে পারবে? পারবে কি? পারবে না তা অমিতজীও জানেন, আমরাও জানি। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেনেশুনে হতভাগ্য গরীব কৃষকদের ভুলবোঝানোর চেষ্টা করছেন। এটা দুঃখের, এটা লজ্জার। এই হল প্রথম আইন। এতে কার ক্ষতি? শুধু মধ্য-নিম্ন-প্রান্তিক কৃষকের ক্ষতি? এই আক্রমণ কি শুধু চাষির ওপর আক্রমণ? এই আক্রমণ তো ভারতবর্ষের সমস্ত সাধারণ মানুষের ওপর আক্রমণ। যার খাবার দরকার তার উপর আক্রমণ।

দেশের দু চার পাঁচ কোটি পুঁজিপতি, বাজারে যাই দাম বাড়ুক না কেন তাদের কিছু আসে যায় না। তাদের বাদ দিয়ে গ্রামের চাষি, গ্রামের ক্ষেতমজুর, শহরাঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষ, ভ্যান চালক, রিক্সা চালক, দোকানদার, নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষ, যাদের খাবার দরকার হয়, তাদের উপর এই আক্রমণ। তাদেরই ক্ষতি। এতকাল আমরা দেখেছি স্বাস্থ্য বেসরকারীকরণ, শিক্ষা বেসরকারীকরণ হচ্ছে। এখন ট্রেন পর্যন্ত বেসরকারীকরণের চেষ্টা হচ্ছে, সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। ওএনজিসি বেসরকারীকরণ করে মুকেশ আশ্বানির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, তার বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। শিক্ষা বেসরকারীকরণে শিক্ষা ব্যবসায়ীদের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। কিন্তু এই বেসরকারীকরণ তো আমাদের ভাতের বেসরকারীকরণ। আলুভাজা খাবেন তার বেসরকারীকরণ। বেগুনভাজা খাবেন তার বেসরকারীকরণ। আপনার ডালের বেসরকারীকরণ। এতো শুধু মাত্র চাষির ওপর আক্রমণ নয়। এই আইন সমগ্র জনগণের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ার জন্য রচিত হয়েছে। এখন কোন ক্ষেত্রে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার জন্য এদেশের সরকারগুলো অতীতে কি করেছে? সরকার প্রথমে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকেই ধ্বংস করেছে। একদিনে না পারলে ধীরে ধীরে করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রের কথাই ভাবুন। সরকার প্রথমে প্রাইমারী স্কুল থেকে ইংরেজি তুলে দিল, পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিল। পড়লেও পাশ না পড়লেও পাশ। সব বিষয়ে শূন্য পেলেও পাশ। এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা হল যে, সরকারি প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনা হয় না। ওখানে ভর্তি হলে ছেলেপেলে মানুষ হবে না। পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে উঠল নার্সারী কেজি স্কুল। যার শিক্ষা কেনার ক্ষমতা আছে সে তার ছেলেমেয়েদের ভর্তি করল ওইখানে। আর শিক্ষা ব্যবসায়ীরা শিক্ষা বিক্রি করে ঘরে তুলতে শুরু করল প্রচুর মুনাফা। শিক্ষার বেসরকারীকরণ সম্পূর্ণ হল।

স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও একই কথা। সরকারি হাসপাতালগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া হল, আর তার জায়গায় ব্যাণ্ডের ছাতার মত গজিয়ে উঠতে লাগলো নার্সিংহোম। ফেল কড়ি মাখ তেল। পকেটে পয়সা থাকলে চিকিৎসা হবে, না থাকলে অসুস্থ প্রিয়জনকে চোখের সামনে বিনা চিকিৎসায় মরতে দেখতে হবে। এই ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীরা প্রচুর মুনাফা ঘরে তুলছে আর অসহায় সাধারণ মানুষ চোখের জল ফেলছে। এই হল স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বেসরকারীকরণ।

খাদ্যের বেসরকারীকরণের যে নীতি সরকার গ্রহণ করেছে তাতেও সেই একই পথ ওরা নিচ্ছে। খাদ্যের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে তুলে দেওয়া হচ্ছিল। এবার একেবারেই তুলে দেওয়া হল। কৃষিজ পণ্যকেনার যতটুকু সরকারি ব্যবস্থা ছিল তাকেই এবার ধ্বংস করে দেবার প্রক্রিয়া শুরু করা হল। আর সেই উদ্দেশ্যেই দ্বিতীয় আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। একচেটিয়া পুঁজিপতিরা গিয়ে

সরকারকে বলছে — ‘তুমি খাদ্যেরবেসরকারীকরণ করবে, আবার APMC মার্কেটখোলারেখে সরকারি দরে চাল, গম, সঘি ইত্যাদি কিনবে’ — এতো একসাথে চলতে পারে না! তাই তোমাকে APMC মার্কেটটা তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয় আইনে সেই ব্যবস্থাই করা হয়েছে।

এখন APMC মার্কেট তুলে দিলে চাষীর ক্ষতি কি? একথা বুঝতেগেলে APMC মার্কেট কি এবং তাতে চাষীর সুবিধা কতটুকু তাবোঝা দরকার। APMC হল একটা বাজার যেখানে গোড়াউন আছে, ফসল ওজন করার যন্ত্র আছে, খুচরো ব্যবসায়ীদের জন্য দোকান ঘর আছে ও অন্যান্য ব্যবস্থা আছে। এই ধরনের প্রতিটি বাজারের অধীনে অনেকগুলো করে গ্রাম থাকে। ধরুন, কোথাও ১০০টা, কোথাও ১৫০টা গ্রাম থাকে। একে বলে APMC মার্কেট এরিয়া। এই সব গ্রামে কোন বহুজাতিক পুঁজি, কোন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের মালিক বা বড় বড় ব্যবসায়ীরা চাষীর কাছ থেকে সরাসরি কৃষিজ ফসল কিনতে পারে না। এই সব গ্রামে ফসল কেনে APMC মার্কেটের এজেন্টরা, যারা ফসল কেনার জন্য একটা কমিশন পায়। চাষীরা APMC মার্কেটে ফসল বিক্রি করার জন্য সরকারকে একটা খাজনা দেয়। বিনিময়ে তারা সরকারি সহায়ক মূল্যে ফসলের দাম পায়। এই APMC মার্কেটগুলো রাজ্য সরকারের অধীন। সারা দেশে এই ধরনের ছোট বড় APMC-এর সংখ্যা সাড়ে সাত হাজার। ফলেবোঝাই যাচ্ছে দেশের একটা অংশের কৃষক সরকারি সহায়ক মূল্যে এখানে ফসল বিক্রি করতে পারে এবং খোলা বাজারের ওপর তার একটা প্রভাব কাজ করে। ফসল কেনার এই যতটুকু সরকারি ব্যবস্থা এখনও বেঁচে বর্তে আছে বিজেপি সরকার তাকেই তুলে দিচ্ছে।



কিন্তু কি করে? নতুন আইনে APMC বাজার থাকছে, কিন্তু তার অধীনে কোন গ্রাম থাকছে না। খোলস থাকছে, প্রাণটা থাকছে না। ওই সব গ্রামে আগে বহুজাতিক পুঁজি লুকতে পারত না, এখন অবোধে ঢুকে যত খুশি কৃষিজ পণ্য কিনতে পারবে।

মোদীজীরা বলছেন, এতে ক্ষতি কি? বরং এতে তো চাষীর লাভ। চাষীরা APMC মার্কেটেও বিক্রি করবে আবার বহুজাতিক পুঁজির কাছেও বিক্রি করতে পারবে — এতে তো চাষীর সুবিধাই হবে। এই সব বক্তব্যের পিছনে ওদের একটা ধূর্তকৌশল কাজ করছে। তা কি? নতুন আইনে আছে বহুজাতিক পুঁজি বা ব্যবসায়ীরা বেসরকারি মাণ্ডি তৈরী করতে পারবে। এবং তাতে সরকারি সাহায্য মিলবে। প্রথম প্রথম বহুজাতিক পুঁজি কৃষককে একটু বেশি দাম দিয়ে প্রলোভিত করবে, আবার সরকারও ফসল কেনার ক্ষেত্রে গড়িমসি করবে, ঠিক মত টাকা বরাদ্দ করবে না, ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করবে না এবং এমন অবস্থা তৈরী করবে যাতে চাষী সরকারি মাণ্ডিতে যাওয়ার সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। এইভাবে সরকারি APMC মার্কেটগুলো রুগ্ন হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে এবং সমস্ত কৃষিজ পণ্যের একমাত্র ক্রেতা হবে কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানি। তারা চাষীকে ইচ্ছামত কম দাম দেবে এবং সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করবে আকাশছোঁয়া দামে। প্রয়োজনে বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে মুনাফা লুটবে ইচ্ছে মত। দেশের ৮৪ শতাংশ মানুষের দৈনিক আয় মাত্র ২০ টাকা। তারা মরবে অনাহারে। পুঁজিবাদী এই ভয়ঙ্কর মন্বন্তর আমাদের সামনে অপেক্ষা করছে। এই হল দ্বিতীয় আইনের ফল।

তৃতীয় আইনে চুক্তি চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোদীজী আর অমিত শাহরা জোর গলায় প্রচার করছে এতে নাকি চাষীর খুব মঙ্গল হবে। কোম্পানির সাথে চুক্তি করে তারা ফসলের ভাল দাম পাবে।

এখন চুক্তি হবে কাদের মধ্যে? একদিকে দুই বিঘা, চার বিঘা জমির মালিক অসহায় চাষী যার ঘরেনেই ভাত, পরনে নেই কাপড়। আর অন্যদিকে বহুজাতিক কোম্পানি — রিলায়েন্স, পেপসি, কোকাকোলা ইত্যাদি। আইনে বলা হয়েছে চুক্তির সময় কোন পণ্য কি গুণমানের হবে তার ভিত্তিতেই চাষী দাম পাবে। গুণমান বলতে A গ্রেড, B গ্রেড, C গ্রেড ইত্যাদি। গ্রেড অনুযায়ী দাম, এ না হয় বোঝাগেল। কিন্তু গ্রেড ঠিক করবে কে? গ্রেড কিন্তু চাষী ঠিক করবে না, ঠিক করবে বহুজাতিক কোম্পানি। এখন ধরুন, সিঙ্গুরের হরি মোড়লের সাথে রিলায়েন্স কোম্পানির চুক্তি হল, হরি মোড়ল A গ্রেডের ১০০ কুইন্টাল আলু কোম্পানিকে দেবে। আলু তো রিলায়েন্স-এর গুদামে হরি মোড়ল জমা দিল, কিন্তু কোম্পানি বলল, তোমার কিছু আলু B গ্রেডের, কিছু আলু C গ্রেডের।

## ২৫ সেপ্টেম্বর গ্রামীণ ভারত বন্ধে অভূতপূর্ব সাড়া/কর্ণাটকের ছবি



ফলে তুমি চুক্তি মত দাম পাবে না, দাম পাবে অনেক কম। কি করবে হরি মোড়ল? রিলায়েন্স কোম্পানির সাথে সে লড়াই করে পারবে? কোম্পানি যে টাকা দেবে তা মুখ বুজে নিয়ে আসা ছাড়া তার সামনে কোন উপায় থাকবে না। আইনে এও বলা আছে ফসল উৎপাদনের পর কোম্পানি ফসল পর্যবেক্ষণ করে যদি দেখে যে তা প্রয়োজনীয় গুণমানের হয়নি তাহলে সে ফসল নাও নিতে পারে। তখন কি করবে হরি মোড়ল? বাস্তবে এ এক অত্যন্ত অসম চুক্তি। এয়েন গামা পালোয়ানের সাথে এক নবজাতকের মল্লযুদ্ধ। আর একেই মোদীজিরা বলছেন, একই প্লাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে চাষী আর কোম্পানির চুক্তি হবে!

আর একটা কথাও মনে রাখতে হবে। পুঁজিবাদ চায় চটজলদি মুনাফা। যে কোম্পানি চাষীর সঙ্গে চুক্তি করবে তার চাষীর জমির ওপর কোন মমতা নেই। সে জমিতে ইচ্ছামত সার, কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহার করে জমির উর্বরা শক্তি নষ্ট করে দিয়ে দুই তিন বছর পর বিদায় নেবে। চাষীর দিকে ফিরেও তাকাবে না। চাষীর আমগু গেল ছালাও গেল। পূর্বের একখণ্ড উর্বর জমির মালিক চাষী এখন এক খণ্ড অনুর্বর বন্ধ্যা জমি নিয়ে কপাল চাপড়াবে। কোম্পানির অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন চাষীর যদি দুঃসাহসও হয় তাহলেও সে কোর্টে যেতে পারবে না। কারণ আইনে কোর্টে যাওয়ার নিদান নেই। আইনে বলা হয়েছে, বিরোধ দেখা দিলে আপস মিমাংসার জন্য একটা বোর্ড গঠন করা হবে। সেই বোর্ডে থাকবে একজন নীচু স্তরের সরকারি আমলা (ধরুন বিডিও বা এসডিও), কোম্পানির প্রতিনিধি আর চাষীর প্রতিনিধি। কোম্পানির প্রতিনিধি একজন উচ্চশিক্ষিত আইনজ্ঞ, আর চাষীর প্রতিনিধি কে হবেন তা তো আমরা বুঝতেই পারছি। ফলে বোর্ডে যে চাষীর পরাজয় হবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আর পরাজিত



হয়ে চাষী অন্য কোথাও আবেদন করবে তারও উপায় নেই। এ হল আইনের জালে আটকে ফেলে কৃষক হত্যার নতুন আয়োজন।

এদেশে যতটুকু চুক্তি চাষ চালু আছে তার অভিজ্ঞতা কি? মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে চিনিকল মালিকদের সাথে আখচাষীদের চুক্তি আছে। মালিকরা বছরের পর বছর টাকা বাকী রাখে, অনেক চাষী টাকাই পায়না। চুক্তি চাষে কর্ণাটকের ফুলচাষীরা সর্বস্বান্ত হয়েছে, বি টি কটনের চুক্তি চাষে মহারাষ্ট্রের তুলোচাষীরা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে — একথাতো আমরা সবাই জানি। এই রাজ্যেও চুক্তিতে মুরগী চাষ হয়। তার অভিজ্ঞতা ভয়াবহ। মুরগি চাষীরা সব হারিয়ে এখন পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

চুক্তি চাষে দুনিয়ার অভিজ্ঞতা কি? আফ্রিকার দেশগুলোর — মালি,ঘানা, জাইরে, সুদান, ইথিওপিয়া, মোজাম্বিক, জিম্বাবুয়ের ছোট ছোট কৃষকরা এখন পথের ভিখারি। ল্যাটিন আমেরিকার আমাজন অঞ্চলের উর্বর জমিতে আমেরিকা ও ফ্রান্সের কলা কোম্পানি চাষীদের দিয়ে চুক্তি চাষের মাধ্যমে কলা চাষ করায়। কলা কোম্পানিগুলো ফুলে ফেঁপে উঠছে, কিন্তু চাষীরা হয়েছে সর্বহারার। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনার শহরে শহরে এসে তারা ফুটপাতে আশ্রয় নিচ্ছে। এই হল চুক্তি চাষের পরিণতি। দুনিয়াজুড়ে এই হল চুক্তি চাষের অভিজ্ঞতা। এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। চুক্তি চাষে চাষীর লাভ হয়েছে এমন কোন উদাহরণ নেই। কোনো জুতসই উদাহরণ ওরা দিতে পারবেন না। তবুও ওরা চাষীর সর্বনাশ করে বহুজাতিক পুঁজির মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলার জন্য এই সর্বনাশা নীতি গ্রহণ করছেন।

## ସାମଗ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ

ସରକାର ଖୁଲୋ ଯଦି ସାଧାରଣ ମାନୁଷେର କଥା ଭାବତେ ତାହଲେ ତାରା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପଥ ଗ୍ରହଣ କରତେ ପାରତେ । କି ପଥ ଗ୍ରହଣ କରତେ ପାରତେ ? ତାରା ଚାଷୀର କାଢ଼ ଥେକେ ଲାଭଜନକ ଦାମ ଦିୟେ ଫସଲ କିନେ ନିତ ଏବଂସେହି ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସନ୍ତାୟ ସାଧାରଣ ମାନୁଷକେ ବିକ୍ରି କରତ । ଏତେ ଚାଷୀଓ ବାଞ୍ଚତ, ଗରୀବ ସାଧାରଣ ମାନୁଷଓ ବାଞ୍ଚତ । ଏଟା ତୋ ଏକଟାଦେଶେର ସରକାରେର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ବ । ଏକେ ଆମରା ବଲଛି ସାମଗ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ । ଅର୍ଥାଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନଗଣକେ ଖାଓୟାନୋର ଦାୟିତ୍ବ ନେବେ । ଏକ୍ଷେତ୍ରେ କୋନୋ ବ୍ୟାବସାୟୀକେ ଡୁକତେ ଦେବେ ନା । ସରକାର ଚାଷୀକେ ସାର ଦେବେ, ବୀଜ ଦେବେ, ଜଳ ଦେବେ, ଚାଷୀର ଫସଲ ଲାଭଜନକ ଦାମେ କିନେ ନେବେ, ସାଧାରଣ ମାନୁଷକେ ସନ୍ତା ଦରେ ଖାଦ୍ୟ ପୋଁଛନୋର ଦାୟିତ୍ବ ନେବେ । ଏହି ଦାୟିତ୍ବ ପାଲନ ସରକାରକେହି କରତେ ହବେ । ଏହି ଖାଓୟାନୋର ଦାୟିତ୍ବ ପାଲନ ନା କରଲେ ସରକାରେର ପ୍ରୟୋଜନ କି ? ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ବ ନେବେ ନା, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟେର ଦାୟିତ୍ବ ନେବେ ନା, ଖାବାରେର ଦାୟିତ୍ବ ନେବେ ନା — ତାହଲେ ସରକାରେର ପ୍ରୟୋଜନ କି ? ଏକଟା ପରିବାରେର କଥା ଭାବୁନ — ଯେ ପରିବାରେର କର୍ତ୍ତା ସନ୍ତାନେର ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ବ ନେୟ ନା, ରୋଗ ହଲେ ଡାକ୍ତାର ଦେଖାୟ ନା, ଖାବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ନା, ଶୀତକାଲେ ଗରମ ଜାମା କିନେ ଦେୟ ନା — ଏମନ କର୍ତ୍ତାର ପ୍ରୟୋଜନ ଆଛି କି ? କି କରବ ଆମରା ଏମନ କର୍ତ୍ତା ଦିୟେ ? ଏକହିଭାବେ, ଯେ ସରକାର ଜନଗଣେର କୋନ ଦାୟିତ୍ବ ନେୟ ନା, ସବକିଛି ତୁଲେ ଦେୟ ବେସରକାରି ହାତେ, ବ୍ୟବସାୟୀଦେର ହାତେ, ବହୁଜାତିକ ପୂର୍ଜିର ହାତେ, ଏମନ ସରକାର ଦିୟେ ଆମରା କି କରବ ? ଏମନ ସରକାରେ

୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତ ବନ୍ଧେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଷାଡ଼ା/ଓଡ଼ିଶାର ଛବି



## ২৫ সেপ্টেম্বর গ্রামীণ ভারত বন্ধে অভূতপূর্ব সাড়া/হরিয়ানার ছবি



আমাদের কোন প্রয়োজন?

এই অত্যন্ত ন্যায়সংগত দাবি তুললেই মোদী-অমিত শাহজাদা বলতে শুরু করবেন — অত টাকা কোথায়? আমরা বলি, টাকার অভাব কী? গত তিরিশ বছরে দেশের ৫০টা পরিবারকে কর ছাড় দেওয়া হয়েছে ৪০ লক্ষ কোটি টাকার উপর, গত ৭ বছরে ওদের ব্যাংক ঋণ মকুব করা হয়েছে ১৪ লক্ষ কোটি টাকার বেশি। এছাড়া লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার অন্যান্য সুযোগ সুবিধা তো আছেই। তা হলে ৫০টা পুঁজিপতি পরিবারের জন্য যদি এত খরচ করা যায় তবে দেশের কোটি কোটি নিরম্ম মানুষের মুখে আহাৰ যোগানোর অর্থ যোগাড় করা যাবে না কেন? এর কী উত্তর দেবে কেন্দ্রীয় সরকার? কোন উত্তর ওদের নেই, কোন উত্তর ওরা দেবেও না। দেবে না, কারণ এইদেশটা গরীব মানুষের জন্য নয়, এই দেশটা গরীবের স্বার্থে চলে না। এই দেশটা চলে আত্মনি-আদানি-টাটা-বিড়লার স্বার্থে। এই দেশটা হল পুঁজিপতিদের দেশ, বহুজাতিক কোম্পানির দেশ। তাই এই দেশে ১ শতাংশ মানুষের হাতে জমা হয় ৭৩ শতাংশ সম্পদ। আর ৮৪ শতাংশ মানুষ দিন কাটায় অনাহারে। যতদিন এই ব্যবস্থা থাকবে ততদিন খেটে খাওয়া গরীব চাষী মজুরের দুঃখের অবসান হবে না। তাই এই ব্যবস্থা ভাঙ্গতে হবে, প্রতিষ্ঠা করতে হবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। তবেই চাষী মজুরের দুঃখের অবসান হবে। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে পাথেয় করেই এআইকেকেএমএস সেই লক্ষ্যে এগিয়ে চলছে, জয় আমাদের হবেই।